অঘোরী ও কালীকথা

অঘোরী
ও
কালীকথা

শুভাশীষ চক্রবর্তী

ব ই ব ন্ধু

Aghori O Kalikatha
Collection of novelettes
by Shubhashish Chakraborty

© Shubhashish Chakraborty

ISBN 978-81-962325-9-7

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৩

প্রচ্ছদ : সুমন্ত গুহ
বর্ণশুদ্ধি : রিয়া নন্দী
হরফসজ্জা : কল্পক

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিশার্স
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫

মুদ্রক : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স,
৩৮ এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : ৩৯৯/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উ ৎ স র্গ

আমার স্নেহময়ী, স্বর্গীয়া মা সর্বানী চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশে

ভূ মি কা

কাটা অঘোরী। হিমালয়ের দুর্গম গিরিবর্ত্মে ঘুরে বেড়ানো এক পিশাচসিদ্ধ সাধক। আসল নাম রুচিন আরোরা, প্রথম জীবনে চরম অসভ্য, অভদ্র এক নাস্তিক। ইউরোপের সার্নে পার্টিকেল ফিজিসিস্ট হিসেবে বেশ কিছু বছর কাজ করার পর, হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে একদিন বেপাত্তা। অনেক খোঁজ করা হল, অনেকভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হল, কিন্তু কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না। কোথায় গেল তাহলে রুচিন আরোরা? এর উত্তর পেতে, পৃথিবীকে প্রায় আট বছর অপেক্ষা করতে হল। জানা গেল রুচিন নাকি হিমালয়ের প্রত্যন্ত পাহাড়চূড়ায়, শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, মরা মানুষের মাংস খেয়ে বেড়ায়। সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা এক মানুষ, লোকে কাটা অঘোরী বলে ডাকে। লোকের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়া এক লিভিং-লেজেন্ড। হিমাচলের বিষ্ণু-প্রয়াগে এক ভয়ানক বিস্ফোরণে, লোক-কল্যাণে অঘোরী আত্মাহুতি দেয়। এরপরেও অঘোরীকে নাকি দেখা যেত, যখন-যখন পৃথিবীতে বিনাশকারী কোনো ছায়া ঘনিয়ে আসে। 'ব্রহ্মাস্ত্র', 'অদৃশ্য-নগরী' ও 'অতল জলের আহ্বান'— অঘোরীর তিনটি টানটান উত্তেজনাবহুল বড়োগল্প, অঘোরী ফিরে এসেছে মানুষেরই কল্যাণকার্যে।

কালী-হিজড়া অবিশ্যি ভীষণ রকমের একজন ডার্ক ক্যারেক্টার। 'বিষ' গল্পে কালী তার প্রথম জীবনের দুর্বিসহ অভিজ্ঞতা বলছে, তার 'হিজড়া হওয়ার' গল্প বলছে, সমাজের এক অসহ্য রকমের নগ্নতা নিয়ে, কালী-হিজড়ার লড়াই এক

পিশাচের সঙ্গে।

'চিরভক্ত' একদমই আলাদা একটি উপন্যাসিকা। পাহাড়ের ওপর এক হারানো মন্দির আর তার সঙ্গে জড়ানো একটি আরবান লেজেন্ড নিয়ে এক অ্যামেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিকের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার গল্প।

পাঁচটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাসিকা নিয়ে এসে হাজির 'কাটা অঘোরী ও কালীকথা', একডালি হাড়-হিম করা ভয় নিয়ে।

—শুভাশীষ চক্রবর্তী

সূচিপত্র

ব্রহ্মাস্ত্র	১১
অদৃশ্য নগরী	৬২
অতল জলের আহ্বান	১১১
চিরভক্ত	১৬৮
বিষ	২০০

ব্রহ্মাস্ত্র

প্রথম সৃষ্ট সত্তা— তার নানান নাম: হিরণ্যগর্ভ, আদি পুরুষ, প্রারম্ভিক বীজ, আদি-কোশ, Primordial Soup, Cosmic Egg— এরকম কত কী।

ও হ্যাঁ, আরেকটি নামেও লোকে জানে।

ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা কথাটি এসেছে ব্রহ্ম + ষ্ণ প্রত্যয় থেকে। অর্থাৎ যে বা যার নিরাকার ব্রহ্মের থেকে উৎপত্তি। অর্থাৎ ব্রহ্মাই হলেন সেই নিরাকার ব্রহ্মের প্রথম সাকার রূপ।

ঋগবেদের নাসাদীয়া সুক্ত বলে যদি বা দধে যদি বা না...সো অঙ্গ ভেদা যদি বা না ভেদা...

এই সংসার, এই ত্রিভুবন, এই পারাবার, এই সব কিছুকে সৃষ্টি করল? কেন সৃষ্টি করল? কেই-বা এর পরিচর্যা করে চলেছে?

হ্যাঁ, সেইই একমাত্র এর উত্তর দিতে পারবে, যে সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয়েছিল।

অথবা সেও জানে না...

ঋকবেদের এই প্রহেলিকাকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কার্ল সাগান নাম দিয়েছিলেন: 'Uncertainty of gods' বলে।

***

"সংসারে এক ওই পুষ্কর ছাড়া, ব্রহ্মার পুজো কোথাও হয় না কেন বলুন তো?"

"পুরোটা ঠিক না। পুষ্কর ছাড়াও ব্রহ্মার মন্দির আঙ্কোরভাটেও দেখতে পাওয়া যায়। কাম্বোডিয়াতেও আছে বহু জায়গায়। বোঝা যায় প্রথম প্রথম ব্রহ্মার পুজো রেগুলারলি হত। তারপর কোনো এক কারণে পুরো বন্ধ হয়ে যায়।"

"সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। কী এমন হল যে রাতারাতি এরকম একজন গণ্যমান্য দেবতার পুজো করাই বন্ধ হয়ে গেল?"

"ওই যে লোকে বলে দেবাদিদেব শিব নাকি শাপ দিয়েছিলেন। সৃষ্টির শুরুতে সেই অসীম নিরঞ্জন লিঙ্গের শুরু আর শেষ না খুঁজে পেয়ে বিষ্ণু

বললেন আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্রহ্মা নাকি মিথ্যা বলেছিলেন সেই সময় আমি খুঁজে পেয়েছি এর শেষ কোথায়। ব্রহ্মার এই মিথ্যা কথায় শিব নাকি অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন তোমার কোথাও পুজো হবে না। আবার আরেক মতে বলে ভৃগু নাকি শ্রেষ্ঠ দেবতা কে, তা জানতে হাজির হন ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্মা তখন নাকি খুব একটা আপ্যায়ন করেননি ওঁর। উনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন কোথাও পুজো হবে না তোমার। শিবলোকে গিয়েও কোনো আপ্যায়ন না পেয়ে শিবকে অভিশাপ দেন তোমার লিঙ্গ ছাড়া কোথাও পুজো হবে না। এই জন্যই নাকি শিবের লিঙ্গ ছাড়া আর কিছু পুজো হয় না। আর ব্রহ্মার পুজোও বন্ধ হয়ে যায়। তবে আমার মনে হয় এই দুটির কোনোটিই আসল কারণ নয়, ব্রহ্মার পুজোর বন্ধ হওয়ার পিছনে প্রথম গল্পটা শৈবদের বানানো, শিবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিস্থাপনের জন্য। আর পরেরটি বৈষ্ণবদের বানানো বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিস্থাপনের জন্য। ব্রহ্মার পুজো বন্ধ হওয়ার পিছনে অন্য কোনো কারণ ছিল।”

“কী সেটা?”

“শুনবেন?” অঘোরী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে হাসল, “শুনুন, বলি তাহলে।”

১

“দেখুন, দেখুন সবকটায় একই প্যাটার্ন,” পরপর স্লাইডগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে কথাগুলি বলছিলেন প্রফেসর মরিসন, “পেট থেকে গলা অবধি কেউ যেন ঝলসে দিয়েছে। দেখুন চামড়া ঝলসানোর রংটা লক্ষ করে,” বেশ কয়েক ধাপ জুম করলেন মরিসন, “দেখতে পাচ্ছেন? নীলের ওপর একটা হালকা সবজে রং। কিছু পুড়লে রংটা তো তামাটে হয়, সজে হল কী করে বলুন তো?”

সারা ঘরে একটা শব্দ নেই। সবাই চুপ করে চেয়ে আছে দেয়াল জোড়া কম্পিউটার স্ক্রিনে।

ছবিটি সম্ভবত কোনো পোর্ট এলাকার। দূরে দাঁড়ানো সারি সারি স্টিমারের লাইন। একদল নাবিক হাঁ করে চেয়ে রয়েছে ওপর দিকে। ক্রেনে করে ঝোলানো একটা দলা পাকানো বিশালাকায় মাছের দেহের দিকে। চোখ ফেটে পড়ছে বিস্ময়ে।

“নীল তিমি— Blue Whale। এটির ওজন প্রায় ৩৫০ লাখ পাউন্ড। গত

বছরের আগস্টে তোলা। এত বিশাল একটি শরীর, সেটাকে নিথর করে, পেট থেকে গলা অবধি ঝলসে মেরেছে। মেরে ছেড়ে দিয়েছে। প্রায় দেড় দিন বাদ একটা ট্রলার প্রাণীটাকে দেখতে পায়, মেক্সিকান তট থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো নটিক্যাল মাইলস দূরে। জায়গাটিতে এমনিতেই খুব 'হোয়েল-হানটিং'-এর জন্য কুখ্যাত। প্রথমে লোকে ভেবেছিল নিশ্চয় কোনো শিকারির দল প্রাণীটাকে মেরে ওর মাংস, ব্ল্যাবার, ডানা, গিলস, ফ্লিপার, ফ্লিউক্স খুবলে বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখা গেল প্রাণীটির সারা শরীরে সমস্ত অর্গ্যানগুলিই অক্ষত— কিচ্ছুটি সরানো হয়নি।"

কেউ কিছু উত্তর না দিয়ে এর ওর মুখের দিকে তাকাল।

আশ্চর্য তো? শরীর থেকে কিচ্ছুটি সরায়নি, তাহলে মারল কেন তিমিটিকে?

"নীল তিমি এমনিতেই এত ভয়ানক শক্তিশালী আর বিশালাকায় প্রাণী যে সাধারণত এদেরকে শিকারিরা ছোঁয় না," প্রফেসর মরিসন বলে চললেন, "পাইলট হোয়েল, বেলুগা, নারহোয়াল আর মিনকী হোয়েল ছাড়া মানুষ সচরাচর বড়ো তিমির দিকে হাত বাড়ায় না। এদেরকে ট্যাকল করাই খুব কঠিন, মারা তো দূরের কথা। প্রশ্ন হল— তাহলে এটিকে কে মারল ও কেন মারল?"

কারোরই কোনো উত্তর নেই।

"এরপর জানেন, অদ্ভুত ব্যাপার। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর। পরপর একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাসের এক নির্দিষ্ট দিন করে এইরকম নীল তিমির মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেছে এলাকাটি জুড়ে। সবকটির মৃতদেহে সেই একইভাবে ঝলসানো দাগ। কেউ যেন তিমিটিকে চিপে ধরে আগুনে পুড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

সবার গা সিঁটিয়ে উঠল। কী সেই বিপুলতা যা নীল তিমির মতন ওরকম এক জলরাক্ষসকে এভাবে মারছে? তাও আবার কিনা মাসের নির্দিষ্ট দিনে? গভীর সমুদ্রের নীচে শুয়ে থাকা কোনো মহাশক্তিশালী ম্যাগনেটিক ড্রাগ? যা কিনা, যা কিছু ওর ওপর দিয়ে যায় তার ওরকম হাল করে দেয়?

না, না এরকম কিছু হলে তো সবচেয়ে আগে ওসেনোলজিস্টদেরই চোখে পড়ত ব্যাপারটা, তাই না?

কই সেরকম তো কিছু কারোর চোখে পড়েনি।

কী আছে তাহলে ওখানে?

অচেনা কোনো তিমিঙ্গিল?

"আবার দেখুন," মরিসন সাহেব ছবি পালটালেন। গভীর সমুদ্রের ওসেন ফ্লোরে খুব হাই পাওয়ারের ফ্ল্যাশে তোলা ছবি, "কিছু মাস যাওয়ার পর, আরও পশ্চিম দিকে। ডেভিলস ট্রায়াঙ্গেলের সমুদ্রের মাটির থেকেও পাওয়া গেল একই ধরনের পোড়া মাটির আস্তরণ। যে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়েছে তিমিগুলোকে, সমুদ্রের মাটিতে পড়ে থাকা আলগী, ফাইটোপ্ল্যাংটন, স্টারফিশ, ছোটোমাছ আর অক্টোপাসের মৃতদেহের স্তুপের ওপরেও একই ধরনের পোড়ার দাগ। দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন দাগটা?"

"হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে বটে।"

বিশাল এক ব্যাসার্ধের এলাকা জুড়ে পাথুরে মাটির ওপর সবুজ রঙের পোড়া দাগ। জলে ভাসছে নিষ্প্রাণ একদল জলীয় জীব। ঝলসে গেছে এক অজানা সবুজ রঙের জ্বালানির শিখায়।

"কিছুদিন আগে, অঞ্চলটির কাছে অনুভূত হয়েছে ভয়ানক চেহারার এক ভূমিকম্প। দেখুন কীরকম মিলে যাচ্ছে, তাই না? সময়, স্থান, পাত্র কীরকম একই সূত্রে বাধা, দেখতে পাচ্ছেন? এখানে কি কোনো সিক্রেট ওয়েপনের টেস্টিং চলছিল? আমরা কি তাহলে কোনো এক গভীর গোপন কোনো মহাশক্তিশালী অস্ত্রের পরীক্ষাগারের ছবি দেখতে পাচ্ছি? ল্যাবরেটরিতে করা বিশাল ভয়ানক কোনো এক্সপেরিমেন্টের পরের চিত্র?"

আবার ঘরে সবাই সবার দিকে তাকাচ্ছে। কারোরই কোনো বাক্যি নেই মুখে।

"কী জানেন, এই ঘটনার পর ধারেকাছের সব দেশকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে এই ঘটনার বিষয়ে। কেউ যদি কিছু জেনে থাকো, আমাদের বলো। কেউই কোনো উত্তর দিতে পারেনি। কেউই কিছু জানে না। এখন মানুষ অনেক সচেতন হয়ে গেছে। এই ধরনের কোনো বিধ্বংসী পরীক্ষার কথা আজকাল আর চাপা থাকে না। নিউক্লিয়ার পরীক্ষা হলে তো থাকেই না— রেডিয়েশন ডিটেক্ট করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। কিন্তু না, সেরকম কিন্তু কিছু হয়নি। নাই এখানে কোনো লনিউক্লিয়ার রেডিয়েশন ধরা পড়েছে, না জলে কোনো বিষক্রিয়া ধরা পড়েছে আর না ধরা পড়েছে দাহ্য কোনো পদার্থের ইঙ্গিত বা সিগনেচার। শুধু একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা গেছে। ভূত্বকের ওপরে বেশ কিছু অঞ্চল জুড়ে একটা বাল্জ— ডুমো হয়ে ফুলে আছে সমুদ্রের তলদেশ। কী যেন এসে খুব জোরে ধাক্কা মেরেছে মাটিতে। কিন্তু কী সেটা— সেটা কিছুতেই এখনও বুঝতে

পারা যাচ্ছে না।”

সবার আরও অবাক হওয়ার পালা।

“জানি কী ভাবছেন,” মরিসন হাসলেন, “কিছু যদি এসে জলের তলদেশের মাটিতে এত জোরে ধাক্কা মারে, তাহলে জলের বায়োন্সি বা প্লবতাই তো তার গতি রোধ করে দেবে।”

“তাহলে তাকে জলের অনেক ওপর থেকে উঠে এসে যথেষ্ট পরিমাণের বেগ নিয়ে এসে জলে ঢুকতে হবে, তাই না?” ডক্টর ভেরোনিকা ম্যাথিউস জিজ্ঞেস করলেন।

“বাইরের থেকে কিছু যদি জলে নামে, সেটা তো আমাদের স্যাটেলাইটই আগে ধরতে পারত,” থমাস রিচার্ডসন বললেন, তাঁর গলায় ঝোলানো নাসার ট্যাগটি ঘোরাতে ঘোরাতে।

“জানি না, তবে আমার মন কী বলছে জানেন,” মরিসন কাঁধ ঝাঁকালেন, “আমরা এই জগতে যা কিছু মেকানিক্স বা বলবিজ্ঞানের কথা জানি— এখানে হয়তো এমন কিছু আছে, যা আমাদের জ্ঞানের নাগালের ভিতরেই নেই...। সম্পূর্ণ আলাদা কিছু এখানে লুকিয়ে বসে কোনো এক খেলা খেলে চলেছে। হ্যাঁ...সর্বৈব কোনো অজানা প্রপঞ্চ... Completely unknown phenomenon।”

সবাই চেয়ে আছে মরিসনের দিকে।

কী...কী বলতে চাইছেন উনি?

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর ভেরোনিকা হেসে উঠলেন, “ওহ কাম অন...দয়া করে আপনার সেই এলিয়েন স্পেসশিপের পুরোনো গল্প শুরু করবেন না। আপনার ভন দানিকেনের পুরোনো কাসুন্দি শুনে শুনে কান পচে গেছে,” ভেরোনিকা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। পেশায় একজন প্যালেন্টোলজিস্ট হলেও বিজ্ঞানের নানান শাখায় প্রগাঢ় জ্ঞান, “আমার মনে হয় এটা কোনো এক ধরনের ফাঙ্গাস। প্যাসিফিক কোস্টলাইন ধরে বেড়ে চলছে। সম্ভবত ওখানে নেমে যদি মাটির স্যাম্পলিং করা যায়, হয়তো আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। বস্তুত আমরা যেটাকে সবুজ রঙের পোড়া দাগ বলে দেখছি সেটা হয়তো এক ধরনের অ্যালগি বা ফাঙ্গাই ছাড়া কিছু নয়। এই দেখুন না— প্যাসিফিক ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি এমন ঘটনা, তাই না?”

ভেরোনিকার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর স্লাইড চেঞ্জ করলেন প্রফেসর

মরিসন, “এই দেখুন। এই দুই ভদ্রলোক। প্রথমজন জার্মান: আলেক্স স্কিমডট। আরেকজন ফ্রেঞ্চ: লুই ব্ল্যাঙ্গে। দুজনেই ইতিহাসবিদ। দুজনেই বেশ কিছুদিন আগে ভারতে এসেছিলেন। আদিম ভারতের নানান বিষয় নিয়ে চর্চা করছিলেন।”

স্লাইড চেনজ হল।

সবাই শিউরে উঠল।

দুজন ভদ্রলোকের ছবি। পেট থেকে বুক অবধি চেরা, সাদা চামড়ায় বাদামি রঙের দাগ। সাদা বেডশিট লাল রক্তের গালিচায় রাঙা হোলি খেলছে।

“দুজনকেই পাওয়া গেছিল ওঁদের হোটেল সুইটে। একজন চেন্নাইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে। আরেকজন দিল্লিতে। সারা ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি–নেই সারা শরীরে কোনো ধস্তাধস্তির ছাপ। এঁদের যা কিছু রিসার্চের কাগজপত্র ছিল সেগুলোও অদ্ভুতভাবে মিসিং। কেউ যেন ফালাফালা করে নষ্ট করেছে এদের সর্বস্ব। অথচ কোথাও কিছু ধরা পড়েনি। এমনকি সিসিটিভিতেও না,” মরিসন সাহেব সবাইকে একবার দেখে নিয়ে ভেরোনিকার দিকে তাকালেন, “আশা করি এটা অ্যালগি-ফাঙ্গাই’র কাজ নয়, তাই না?”

“এরপর, আরও কিছুদিন বাদ,” স্লাইড চেঞ্জ হল। আরেকজন সুঠাম চেহারার অত্যন্ত সুপুরুষ শুয়ে আছেন। সাদা চাদরে মোড়া। অনুসন্ধিৎসু চোখে চারপাশে ইতস্তত কিছু পুলিশ, “প্রফেসর ইভান বার্টন। ইনিয়ো এক ইতিহাসবিদ। লাহোরের কাছ থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে এক হোটেলে বিলকুল একইভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। কোথাও কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই, নেই কোনো ধস্তাধস্তির ছাপ।”

মরিসন সাহেব পকেটে হাত গুঁজে এগিয়ে এলেন কয়েক পা।

ছোটো মতন একটা কনফারেন্স রুম। উনি ছাড়াও আরও সাতজন লোক বসে।

থমাস রিচার্ডসন, নাসার জ্যোতির্বিদ।

ভেরোনিকা ম্যাথিউস, একজন প্যালেন্টোলজিস্ট।

ক্যাথি ম্যাক-কারটার, একজন বায়ো-আর্কিয়োলজিস্ট।

জোসেফ রিচার্ডসন, একজন সিআইএ অফিসার।

থমাস সিম্পসন, একজন সার্ন’র পার্টিকল ফিসিসিস্ট।

এরিক নাইরন, আই-এম-এফ এজেন্ট।

প্রফেসর গার্গী গুপ্তা, ইতিহাসবিদ, ক্রিপ্টোলজিস্ট।

সাত জোড়া চোখ। ভারি বিরল কম্বিনেশন, তাই না? বোধ করি কারোর সঙ্গে তো কারোর কোনো মিলই নেই।

হাসলেন মরিসন সাহেব মনে মনে। মিল নেই, তাই কি?

"Thoughts?" হাঁক পাড়লেন মরিসন সাহেব, "কেউ কিছু বুঝতে পারছেন?"

"দেখুন আমি তো আগেই বলেছিলাম," হাত ওঠালেন জোসেফ রিচার্ডসন, "পুরো জিনিসটাকে দেখেই মনে হচ্ছে কেউ বা কারা কোনো ধরনের কোনো অস্ত্র শানাচ্ছে। প্রথমে সমুদ্রের নীচের অসহায়-অবলা প্রাণীর ওপর পরীক্ষা চালানো হল। তারপর ব্যাপারটা মনমতো হলে জিনিসটা মানুষের ওপর প্রয়োগ করা শুরু হল।"

"কিন্তু এই হিস্টরিয়ানদের মারা হল কেন?" গার্গী জিজ্ঞেস করল, "দেখুন সবকটা মৃত্যুই কিন্তু হয়েছে ভারত ও পাকিস্থানকে ঘিরে। মনে হচ্ছে না, ব্যাপারটা রিলেটেড? কেউ যেন কিছু ঢাকতে চাইছে? হয়তো এঁনারা প্রত্যকেই কিছু না কিছু জানতে পেরেছিলেন— কোনো একই সূত্র। আর তাই তাঁদেরকে সরানো হচ্ছে। দেখুন না, ওঁদের সঙ্গে ক্যারি করা সব রিসার্চ পেপারগুলিও কেমনভাবে সরানো হয়েছে।"

মরিসন মাথা নাড়লেন সম্মতিতে, "যদি তাইই হয়, তাহলে অনেকগুলি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রতিটি মৃত্যু এমনভাবে হয়েছে যে-কোনো ছাপই পাওয়া যায়নি। যদি এঁদেরকে সত্যিই কেউ এসে মেরে গিয়ে থাকে, তবে পায়ের ছাপ, হাতের ছাপ, কিছু তো ফেলে যাবে, তাই না? হাওয়ায় তো আর মিলিয়ে যেতে পারে না।"

"ঠিক। সঙ্গে কি এমন গোপন করা হচ্ছে যে এতগুলো মানুষকে প্রাণ দিতে হল?" এরিক নাইরন যোগ দিলেন, "কি এমন অস্ত্র যা নীল তিমির মতন এমন ভয়ানক প্রাণীকে ওরকমভাবে ঝাঁঝরা করে ছেড়ে দিল? অস্ত্রটি কি ইচ্ছানুসারে এনার্জি-রেগুলেশন করা যায়? মানে, বাড়ানো-কমানো যায়? নইলে যে শক্তিতে এরা নীল তিমিকে ঘায়েল করল, সেই শক্তি দিয়ে নিশ্চয় একটা মানুষের ওপর চালালে, মানুষটা সম্পূর্ণভাবে ঝলসে যেত। তা কিন্তু হয়নি— মানুষটাকে কিন্তু সেটুকুই জ্বালানো হয়েছে যতটা দরকার ছিল। যেন হত্যাকারী বোঝাতে চাইছে

যে অস্ত্র দিয়ে এক রাক্ষসকে ধরাশায়ী করতে পারি, সেটা দিয়ে এক মানুষকেও মারতে পারি। আবার প্রয়োজন হলে..., আরও বড়ো কিছুও করতে পারি।”

শিউরে উঠল সবাই।

আরও বড়ো কিছু মানে?

গোটা পৃথিবীর ওপরই কি চালাতে পারে সেই অস্ত্রকে? নিঃশেষ করে দিতে পারে প্রাণকে...সমস্ত বায়ো-মাস?

সেদিকেই কি আততায়ী এগোচ্ছে?

মরিসন চশমা খুলে চোখ মুছলেন, “আমি কাউকে চিনি। যে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।”

হু? কিয়েন? কৌন? কই? ওইয়ের? ওয়ের ইস্ট দাস?

একসঙ্গে ঘরের সবকটা মানুষ নিজের ভাষায় প্রশ্নটা করল।

কে?

“আমার ওপর ভরসা রাখুন,” চোখ বুজে চেয়ারে বসলেন মরিসন, “বিশ্বাস করুন, এই সময় সংসারকে যদি সত্যিই কেউ বাঁচাতে পারেন...তবে আমি একজনের কথাই ভাবতে পারি।”

২

“কখনও লক্ষ করেছেন পুরোহিত মন্ত্র পড়ার সময় বলেন— ফাল্গুনমাসে কৃষ্ণপক্ষে মেষ রাশিতে, দ্বিতীয়ার্ধে...এই দ্বিতীয়ার্ধেটা কেন বলেন ভেবে দেখেছেন?” অঘোরী প্রশ্ন করল।

“হ্যাঁ শুনেছি— কিন্তু কেন বলে তা তো ভাবিনি।”

“কারণটা খুব সহজ,” অঘোরী হাসল, “এখন যে ব্রহ্মা আছেন, হিসেব অনুযায়ী ওঁর বয়স ৫১। তাই ‘দ্বিতীয়ার্ধে’ কথাটি বলা হয়। অর্থাৎ সেকেন্ড ইনিংস।”

“মা...মানে? ব্রহ্মার বয়স মানে? ব্রহ্মা তো আদি-পুরুষ। সব কিছুর আগে তিনিই সৃষ্ট হয়েছেন— তিনি কি সময়ের ঢেউয়ে আবদ্ধ নাকি?”

“হ্যাঁ। আদি পুরুষ হলেও, যোগমায়ার মায়ার বাইরে নন। তাই ব্রহ্মারও জন্ম হয়, তাঁর জীবনচক্রও আছে, আবার তাঁর মৃত্যুও আছে। ব্রহ্মা প্রতিদিন সৃজনকর্ম শুরু করেন— নতুনভাবে সংসার আসে, সব কিছু নতুন করে তৈরি

হয়। ব্রহ্মার একদিন মানে হল মানুষের হিসাবে ৮৬৪ কোটি বছর। একটি দিনকে এক কল্পকাল বলা হয়। এক কল্পে ১০০টি মহাযুগ থাকে— এক মহাযুগ অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এরকমভাবে ৩৬০টি কল্প নিয়ে ব্রহ্মার একটি বছর শেষ হয়। এরকম করে ১০০টি বছর বেঁচে থাকার পর ব্রহ্মার লয় হয়। আবার নতুন ব্রহ্মা আসেন— আবার নতুন করে সব কিছু শুরু হয়। এরকম ১০০ বার চলার পর, ব্রহ্ম নিজের মধ্যে সব কিছু দলা পাকিয়ে নিয়ে দ্রবীভূত করে পরমশূন্যে লীন হন আরও ১০০ বছর। তারপর আবার শুরু হয় নতুন করে সব কিছু। হিসেব অনুযায়ী এখন যে ব্রহ্মা আছেন তিনি তাঁর ৫১ বছর পেরিয়ে এখন যে কল্পে এসেছেন, তার নাম 'শ্বেত-বরাহ-কল্প'।"

মাথাটা পুরো ঝিমঝিম করছে।

"ব্রহ্মাণ্ডের বয়স বিগ ব্যাং থিয়োরি অনুযায়ী ১৩৮০ কোটি বছর। এর মধ্যে ব্রহ্মার তো অনেকবারই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও লয় করে ফেলার কথা। কই তা তো হল না? ব্রহ্মাণ্ড তো ভালোই আছে, নিজের তালে বেড়ে চলেছে।"

"কে আপনাকে বলেছে বিগ ব্যাং থিয়োরি সঠিক?" অঘোরী হাসল আবার, "বিগ-ব্যাং ঠিক হলে অনেক অনেক প্রশ্ন রয়ে যায়, যার উত্তর তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকও দিতে পারেন নি। প্রশ্নগুলি করে আপনার মাথা খারাপ করতে চাই না— শুধু এটুকু বলছি, এক্ষেত্রে কিন্তু সৃষ্টি মানে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে না।"

"তাহলে?"

"ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এরকম অনেক অনেক জগৎ আছে— যেমন আমাদের সৌরজগৎ। প্রতিটি জগতে সময় আলাদা আলাদা খাতে বইছে। আলাদা আলাদা নিয়ম। আলাদা আলাদা সৃষ্টিতত্ব। আলাদা আলাদা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। পরাৎপর ব্রহ্ম তাঁর সৃজন-লয়-পালনের জন্য নানান রূপে খেলা করে চলেছেন হাজার হাজার সংসার জুড়ে, স্বপ্ন দেখে চলেছেন, তাঁর যোগনিদ্রায়। তৈরি হচ্ছে, পালন হচ্ছে আবার লয় হচ্ছে। বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগানের ভাষায়— 'god does not exist in the dreams of man, rather man exists in the dreams of god...' অর্থাৎ সব কিছুই কোনো এক অজ্ঞাত সত্তার স্বপ্নে হয়ে চলেছে। আকাশে এত তারা, এত গ্রহ, সূর্য-চাঁদ, পৃথিবীতে প্রাণ, ঝরনার রিনরিনে জলের কলতান, প্রজাপতির ফুলের রেণু কুড়োচ্ছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ, এ সবই কোনো বিশাল এক সত্তার মন্মথের ইচ্ছায় বুনন হয়ে চলেছে। সেই

অজ্ঞাত সত্তার কোনো নাম নেই। তাঁর কী রূপ, কী গুণ কেউ বলতে পারেনি। তাই রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথায় বেদ-উপনিষদ-গীতা সব এঁটো হলেও, ব্রহ্ম এঁটো নন। কেউ তো জানে না তিনি যে কী...তা বলতেই পারেনি।”

কিছুই বুঝলাম না, “ব্রহ্মার পুজোটা বন্ধ কেন হল, সেটা তো বলুন?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অঘোরী, “সে এক আজব প্যাঁচ, বলছি। শুনুন।”

***

“রুচিন আরোরা,” মরিসন সাহেব বলা শুরু করলেন, “আমার খুব পুরোনো বন্ধু, জানেন? সার্নের ডাকসাইটে পার্টিকল ফিজিসিস্ট, চরম নিষ্ঠাবান নাস্তিক, কলামনিস্ট, সাংঘাতিক অহংকারী ও বিরক্তিকর তার্কিক। সেবার মনে আছে আমাদেরই কলিগ জেমস ম্যাথিসনের বিয়েতে গিয়ে সবাই গেছি। ওয়াইন হাতে নিয়ে রুচিন এসে দাঁড়াল আমার আর আর্থারের পাশে। আর্থার, আমি আর রুচিন একই ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। তারই আগেরদিন বোসন পার্টিকেল নিয়ে একটা কী যেন আর্থার লিখছিল সাপ্তাহিক এক আর্টিকেলে। ব্যস রূচিনের চোখে সেটা পড়েছে। সেখানেই ভয়ানক ঝগড়া শুরু, প্রচণ্ড চ্যাঁচামিচি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকে কান পেতে শুনছে কী নিয়ে ঝগড়া চলছে রে বাবা? এসব কী ভাষা? কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডাইনামিক্স, ফেইনম্যানের ইকুয়েশন থেকে শুরু করে ইলেক্ট্রো-উইক ফোর্স, লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটি, উফফ মনে হচ্ছে ফিজিক্সের বাপের শ্রাদ্ধ চলছে। শেষমেশ রাগ-মাগ করে আর্থার ওয়াইনের গ্লাসটা টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। জেমস বিয়ের আসর থেকে উঠে দৌড়ে দৌড়ে এসে দ্যাখে রুচিন লন্ডভন্ড দর্শকের আসরে বসে বসে ওয়াইন আর অলিভ চিবোচ্ছে আর মনে মনে হাসছে। জেমস সেদিন প্রথম বলেছিল কথাটা ওকে— মাই ডিয়ার ব্রাদার, গ্রো আপ।”

সবাই তাকিয়ে আছে স্ক্রিনের ওপর। টুইড জ্যাকেট আর নীল বুটকার্ট প্যান্টে, অনুত্তীর্ণ পঁয়ত্রিশের দারুণ সুপুরুষ এক যুবক কী যেন পাশে দাঁড়ানো আরেক পুরুষকে বোঝাচ্ছে।

“তারপর কী হল কে জানে— লোকটা সব ছেড়ে দিয়ে নিপাত্তা। অনেক খুঁজলাম আমরা। আমি ইন্ডিয়ায় ওর বাড়িও এসেছিলাম আগে, তাই বাড়ি খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। শুনলাম ওর মা মারা গেছে। তারপর থেকে